Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

‘ভূতজ্যোৎস্না’ : বিশ্লেষণের আলোয়

শম্পা ভট্টাচার্য

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/9_Sampa-Bhattacharya.pdf

সারসংক্ষেপ: ভারতবর্ষের মতো দেশের বিশাল একটি অংশে ছড়িয়ে আছে নিম্নবিত্ত সমাজ বা ব্রাত্য জন। রাঢ় অঞ্চল, বেদে বেদেনী, মাঝিদের নিয়ে বাংলাসাহিত্যে আলোচনা হলেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের অন্ত্যজ মানুষের কথা তেমনভাবে উঠে আসেনি কারো লেখাতেই। বর্তমান সময়ের লেখক নলিনী বেরার গল্পের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে পিছিয়ে পড়া মানুষগুলির সংস্কৃতি, আচার বিচার, বিশ্বাস সংস্কার, নিত্য নৈমিত্তিক জীবনসংগ্রাম। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিকূলতায় জীবন যাপন যে কতখানি সংকটময় — তা ব্যক্ত হয়েছে তাঁর গল্পগুলিতে। আমার আলোচ্য ‘ভূতজ্যোৎস্না ’ গল্পটিতে অন্তহীন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করা দুটি চরিত্রের কথা বলা হয়েছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে বাস করা জীবনে শিক্ষা একটা উপহাসের বিষয়। নিরন্তর খেটে খাওয়া জীবনে শিক্ষার সঙ্গে তাদের জীবনে যোগ স্থাপন যে একেবারে অসম্ভব — তাই এই গল্পে ব্যক্ত হয়েছে।

সূচক শব্দ: দারিদ্র্য, জীবনসংগ্রাম, শিক্ষা, প্রকৃতি, মানুষ

নলিনী বেরা রচিত অন্যতম গল্প ‘ভূতজ্যোৎস্না’। জ্যোৎস্নাময় চরাচরে ভূত নামক অলৌকিক মানুষের চলাফেরা। সাধারণ ছাপোষা শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে পণ্ডিতম্মন্য কয়েকটি মানুষের বিদগ্ধমূলক কথোপকথন আর গল্পের শুরুতে ঐশ্বর্যময় ধরিত্রীর বর্ণনা — সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির উজ্জ্বল প্রকাশ। পাঠকবর্গ ইতিমধ্যেই অবগত আছেন যে নলিনী বেরা সহজ সরল ভাষায় গল্প রচনা করলেও তার মধ্যে থাকে গূঢ়ার্থ, যে অর্থ হয় হেঁয়ালিময়, অনর্গল পাঠের মধ্যে কিঞ্চিৎ হোঁচট খায় পাঠক আর গল্পের নিহিত অর্থ তখন হয়ে ওঠে অন্যমাত্রিক। এই গল্পটিতেও ইলিউশন আর রিয়েলিটির এক আশ্চর্য দ্বান্দ্বিক এবং স্ববিরোধী সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। গল্পটি বিশদে আলোচনা করলে এই তত্ত্বের প্রমাণ মেলে।

‘ভূতজ্যোৎস্না’ গল্পে বেশ ক’টি চরিত্র। বিবিধ জীবিকা তাদের। কিন্তু কেউই স্বচ্ছল পরিবারের নয়, অনিয়মিত অনিশ্চিত জীবন যাপনে তাদের বেঁচে থাকা। কংসহরি ঢালী আর সরিন্দর দলুই এর পরিচয় প্রথমে নেওয়া যেতে পারে। হাড় জিরজিরে দুটি লোক তারা। লেখকের ভাষায় — “দুজনেরই দেহ আলকাতরা। কারোরই পরনে কাপড় নেই বললেই চলে, আড়াই হাতেরও কম খেটো গামছায় লেংটির মতো করে কোনমতে কোমরটা জড়ানো। পাছার আ-ঢাকা মাংসল ধরিত্রী, যেখানে দু-চাট্টা ঘন লোম-চুল, সেখানে আলকাতরার পোঁচ একটু বেশি, এই যা।”[১]

যে খালে মাছ ধরছে তারা, তা এখন বর্ষার জল পেয়ে ভরা যুবতী। গ্রাম বাংলার চিরচেনা ছবি লেখকের বর্ণনায় প্রকাশিত। ছাতিনাগাছ, আকন্দগাছ, বেনাবুদা, কুশঝাড়, মরাকাঠে ভর্তি সে জায়গা ‘খাল-মুহে’ নামে পরিচিত। সরিন্দর আর কংসহরির জীবিকা সম্পর্কে লেখক বলেছেন — ‘সজনে ডাঁটার মতো কংসহরির হাতে-পায়ে, শিরা-উপশিরা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এমন জট পাকিয়ে গিয়েছে যে লোকে তাকে ‘সজনে-খাড়া’ বলেই ডাকে। কংসহরি ‘সজনে-খাড়া’ আর সরিন্দর ‘মাছের পোকা’। সারাদিন খালে-বিলে রোদে-জলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে ঘুনি পাটা চারগোড়িয়া মাথাফাবড়ি জাল ফেলে সরিন্দর মাছ ধরে’। দুজনেই গোমুখ্যু, কারো পেটেই বিদ্যের বহর নেই এতটুকু। দুজনের জীবনের একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ‘মৎস্য ধরিব খাইবু সুখে’’। কিন্তু বিগত কয়েক মাস তীব্র খরা চলার দরুণ মাছ টাছ কিছুই ধরতে পারেনি তারা, ফলে ‘খেতে না পেয়ে দু’জনেরই পেটে খোঁদল

হয়ে গিয়েছিল এক বিঘৎ'। এ হেন গ্রাম্য কংসহরি আর সরিন্দর নদীতে বর্ষার ঢল নামতে দেখে জীবনে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং ভুসাচিংড়ি সরপুঁটি মৌরলা ধরার আশায় পুলকিত হয়ে যায়। এ তো প্রাত্যহিক জীবনচর্যার ইঙ্গিতবাহী। কিন্তু খটকা লাগে তখন যখন দেখি সরিন্দরের মুখে উচ্চারিত হয় আর্নেস্ট হেমিংওয়ের 'ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দি সি'র কথা, যেখানে জীবনের আশাবাদের কথা ধ্বনিত। আর শোনা যায় দার্শনিক উক্তি — 'জীবন মানে যুঝি যাও টিকি থাকো। চার্বাক দর্শনে আছে নি-যেন জাতানি জীবন্তি?" কংসহরি তাকে চার্বাক দর্শন বা শেক্সপীয়রের বাণী বলতে নিষেধ করে, কারণ তাদের বিদ্বান শিক্ষিত মানুষের বাণী উচ্চারণ করলে তো আর জীবন চলবে না, তা সত্ত্বেও সরিন্দর উচ্চারণ করে আলবেয়ার কামুর 'মিথ অব সিসিফাস'। জীবনের সঙ্গে এ এক বিষম অসঙ্গতি — যাদের পেটে এক ফোঁটা বিদ্যে নেই, তাদের মুখে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, কাম্যু, চার্বাক এদের উক্তি জীবনের তীব্র ব্যঙ্গকে নিশানা করে। লেখকের রচনার এক বিশেষ রচনাশৈলী চোখে পড়ে আমাদের। হাসিও পায়, আবার বেদনার রঙে ধূসরিত হয়ে ওঠে মন। যে দেশের মানুষকে শ্রম নির্ভর জীবনযাত্রার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়, নিত্যদিন না খেতে পাওয়াই যাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন তাদের মুখে এমন মহাপুরুষের বাণী তীব্র বিদ্রূপ ছাড়া আর কী? কিন্তু এর মধ্যেই লেখক জীবনের সার সত্যকে ব্যক্ত করে দিয়েছেন, 'জীবন মানে যুঝি যাও টিকি থাকো।' আর কংসহরির মুখে উচ্চারিত বাণীটিও চরম সত্য রূপে প্রতিপন্ন হয় — 'আওয়ার লাইফ হ্যাজ নো ফিউচার, ইট ইজ এ সিরিজ অব প্রেজেন্ট মোমেন্টস' — এ তো সাবলটার্ন মানুষজনের জীবনের চরম কথা, গল্পকার নির্মম সত্যকেই তুলে ধরেন অনায়াসে।

নাকো হাড়ির বৌ পাড়ায়-পাড়ায় 'পোয়াতির নাড়ি' কেটে বেড়ায়। চাঁদের আলো পড়েছে চারিদিকে। তার মধ্যে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার ধাঙড়টোলিতে যাচ্ছেন নাকো বৌ এর কাছে একটা চিঠির মানে বোঝার জন্য। সেই চিঠি পড়ে গড়গড় করে মানে বলে দিল নাকোহাড়ির বৌ। ক্রিস্টোফার কডওয়েলের 'ইলিউশ্যান অ্যান্ড রিয়ালিটি'থেকে কবিতা বললো — এও জীবনের অসঙ্গতির এক চিত্র। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের সঙ্গে উচ্চবিত্ত সমাজের কোনো যোগই নেই, তাই ব্যঙ্গ সহকারে ব্যক্ত হয়েছে এখানে। জাতে ডোম সৃষ্টিধর আগুয়ান। ঘরে তার দুই স্ত্রী। তারও কঠোর জীবনসংগ্রাম। বাঁশ-বেতের কাজ করে সে। বাঁশের আকাল হওয়ার জন্য এর ওর বাড়ি থেকে চেয়ে চিনতে বেশি দাম দিয়ে কেনে বাঁশের পাতিয়া, তারপর থেকে পচিয়ে, রঙ করে বাঁশের ঝুড়ি-কুলো-ঠেকা-পাছিয়া-টুকরি বুনে এগ্রাম থেকে ওগ্রামে ঘুরে বিক্রি করে সৃষ্টিধর। তার নেশা 'পস্তোডুলির রস গেলা'। 'পস্তো-ডুলি' নেশার জোগাড় করতে সৃষ্টিধরকে বাঁশ-বেতের কাজ করা ছাড়াও আরো কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। 'কাজ' বলতে ছটো ছটো পাঁঠা — বাচ্চার অন্ডকোষ কেটে খাসি করা। এসব কাজে একমাত্র ধারালো বাঁশপাতিয়াই সৃষ্টিধরের হাতিয়ার। আর সেই কাজ থেকে রোজগার করে দুটি অন্ডকোষ, এক থালা সেদ্ধচাল, একটা আলু, একজোড়া হলুদ মাখানো পান-সুপারি, দক্ষিণা বাবদ আড়াইশো কী তিনশো গ্রাম পোস্ত খোল। দারিদ্র্যের সংসার তার, কিন্তু দুধারে কুচলা, করণ, শ্যাওড়া, বেল, বড়-জোড়-বট-অশ্বত্থের গাছ পেরিয়ে তার ঘর, আকাশের চাঁদের ছায়া এসে পড়ে তার পথ চলায়। এখানেও খটকা। এ হেন সৃষ্টিধরের বাড়িতে আসে স্থানীয় হাই-ইস্কুলের হেডমাস্টার শ্রী অমূল্যধন দে, ডবল এম.এ। সৃষ্টিধরের কাছে তার আবদারও অদ্ভুত — শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের একটি অংশের ট্রান্সলেশন এবং সৃষ্টিধর যখন বলে 'সমিস্যাডা কি'? তখন অমূল্যধনের প্রশ্ন 'গফুর জোলার পরে "ইজ" না "আর" বসবে'? এও জীবনের এক শ্লেষাত্মক দিককে তুলে ধরেছেন লেখক। দারিদ্র্যই যে ভারতবর্ষের মূল বিষয়, দুবেলা খেতে না পাওয়া, নটি ছেলেমেয়ে দুই স্ত্রীকে নিয়ে দারিদ্র্যময় সংসার চালানো সৃষ্টিধরের পক্ষে সত্যি কী সম্ভব লেখাপড়ার সঙ্গে সংস্রব রাখা? এই ইঙ্গিতপূর্ণ বিষয়টিও কিন্তু পাঠকের দৃষ্টি কাড়ে।

গরুবাগাল অনন্ত 'ঠ্যাঙা' হাতে ঘুরে বেড়ায় মাঠে ঘাটে। 'গরুর ডাক নকল করে, মাঝে মাঝে চার পা বানিয়ে গরুর মতোই হাঁটে। লোকে তাকে গরু বলে। লেখকের বক্তব্য থেকে জানা যায় অনন্ত লেখাপড়ায় গণ্ডমূর্খ। শুধু তাই নয়, এই বয়সেও ঘুমের ঘোরে বিছানায় মূত্রত্যাগ করে, লোকে তাকে মূত্রা বলে। এ হেন অনন্ত আকাশে ডিমের কুসুমের মতো চাঁদ, পুকুরের হিলহিলে জলে চাঁদের প্রতিবিম্ব, জল-জ্যোৎস্না দেখে। জ্বরে

আক্রান্ত অনন্ত বন্ধু কৈলাশকে বলে — "রঙের পোঁচ, তুলিটানের কায়দাটা একবার দেখিছু, ক্যালাস? ফাটাই দিছে নি? ভ্যানগঘ, পল গঁগ্যা আর মাতিসে সব এক জায়গায়, কি বুঝলু?" আর ক-অক্ষর গোমাংস কৈলাস বলে 'তবে দেখিশুনি মোর তো রিল্‌কে, সোও যে — দ্য স্কাই সুটস অন দী ডার্কেনিং ব্লু কোট —।' অনন্ত, কৈলাস দুজনেই লেখাপড়ার সংস্পর্শ বর্জিত, কিন্তু তাদের চোখের সামনে কী নানা বর্ণের চিত্র ভাসে না? কখনো চিরোল চিরোল ডগাবিশিষ্ট হাল্কা সবুজ বনস্থলির ওপর ঝিরিঝিরি রোদ, তারও ওপর বিচিত্র বর্ণের থোকা থোকা মেঘ, চোখের সামনে ভাসে পুকুরের সিঁড়িতে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা রাণুবৌদি, কৈলাস মনে মনে আওড়ায় নেরুদার কবিতা। এখানেও জীবনের অসঙ্গাতি; পাবলো পিকাস, নেরুদা বইয়ের অক্ষরে পড়া না থাক, চোখে দেখা না থাক, তাদের ভাবকল্পনায় যে প্রেমচেতনার কোনো অভাব নেই, তা ব্যক্ত করেছেন লেখক।

দরিদ্র চাষী হারু। নিজের সামান্য ক'বিঘে জমি আছে, কিন্তু নিজস্ব হাল-বলদ নেই, সবই কেনা, ধার করা। লেখাপড়া না শিখলেও হারু পরিশ্রমী। তাই সে যেটুকু সময়ের জন্য হাল-বলদ পেয়েছে, একমনে তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি। তার চাষের কাজে সঙ্গা দিচ্ছে বউ আহ্লাদী, ছটো ছেলে, এ একেবারেই শিশু, কিন্তু এতই দরিদ্র তারা যে শিশুটির অঙ্গো কোনো বস্ত্র নেই। কেজিও কানুনগো সাহেব লেখালেখি করতে ভালোবাসেন হারুচাষীকে অনুরোধ করেন 'থিওরি অব্ নভেলস্‌টা' বুঝিয়ে দিতে। কিন্তু জীবনসংগ্রামে সামিল হারু চাষী বলদ ঠেঙাবে নাকি থিওরি বোঝাবে? এও তো এক অসম বিপ্রতীপ ব্যাপার। শ্রমনির্ভর মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে না পারলে সভ্যতার অবশেষটুকু অসম্পূর্ণই থেকে যায়। হারুর কাছ থেকে জীবনের পাঠ নিতে চান কানুনগো আর হারুকে জিজ্ঞাসা করেন সঠিক উচ্চারণটা কী? ডন কুইকসোট, না ডন কিউহোট? আহ্লাদির মুখ থেকে বেরিয়ে আসে মিখাইল বাখতিনের কথা।

গল্পের শেষ অংশে কংসহরি আর সরিন্দরের জীবনসংগ্রাম। চারগোড়িয়া জাল কাঁধে বেরিয়েছিল 'মাছের পোকা' সরিন্দর। হাড়-জিরজিরে লোক দুটি অতি সন্তর্পণে মাছ ধরছিল জালের সাহায্যে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। থম মেরে আছে চারিপাশ। লেখকের বর্ণনায় ধরা পড়ে মায়াময় চিত্র — "সমস্তকে, সব কিছুকে চাঁদ যেন গেঁথে ফেলেছে, এ-ফোঁড় — ও-ফোঁড়। ধীরে ধীরে টেনে তুলবে, টেনে তুলবে সরিন্দর-কংসহরিকে, গুটিয়ে আনবে সৃষ্টিধর হেডমাস্টারকে, ছেঁকে তুলবে অনন্ত-রাণুবউদিকে, হ্যাঁচকা টানে হারুচাষী-কানুনগোকে, বিডিও নাকোহাড়ির বউ বঁড়শিতে গাঁথা হয়ে উঠে আসবে।"[২]

মহাজাগতিক আকর্ষণে সমস্ত মানুষই যে পরস্পরের সঙ্গো সংবদ্ধ, তাই লেখক বলতে চেয়েছেন হয়তো এর পর তাদের প্রাত্যহিক জীবনসংগ্রাম। এই জীবনসংগ্রামে বন্ধুত্ব কখনো কখনো প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। সমালোচকের ভাষায় বলা যায় — "এরকমই আরো সব উল্টোপাল্টায় গল্প যেখানে শেষ হয়, তখনই চেনা যায় মানুষগুলোকে। দেশকুল গৌরব পন্ডিতবর্গের বুদ্ধিচাতুর্যের সঙ্গো যেমন বৃহত্তর শ্রমনির্ভর দেশজনতার জীবনচর্চার কোন সঙ্গাতি নেই, অবোধ মূঢ়দের মগজে পণ্ডিতি ঢুকলে বোধহয় এমনটাই হবে। শেষ পর্যন্ত অহংটুকুই টিকে থাকবে। সংশয় অবিশ্বাস আর অপহ্নব। পরস্পরের চোখে সকলই নকল মানুষ।"[৩]

'ভূতজ্যোৎস্না' নামটিও চমৎকার। গল্পের মধ্যে চাঁদ, চাঁদের আলো, জ্যোৎস্না শব্দগুলি এসেছে বার বার। চাঁদের আলোর স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে আছে গল্পের মধ্যে। সূর্যের খররৌদ্রের বর্ণনা নেই কোথাও। গল্পের নিয়ন্ত্রক এক অদ্ভুত চাঁদ, যে বাস্তব এবং বাস্তবের চেয়ে অধিক কিছুকে গেঁথে ফেলছে "এফোঁড় ওফোঁড়", ফলে পার্থিব অস্তিত্ব নিয়েই জাগছে সন্দেহ আর সেই সন্দেহজাত অনিমেয় ভ্রমপরিণতি ঘটেই চলেছে যুগপৎ অনন্ত প্রবাহে। জ্যোৎস্নার আলোয় চরাচর মায়াবী, সরিন্দর-কংসহরি দুজনেই স্পষ্টভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না নিজেদের। এই গল্পের প্রাণকেন্দ্রে সুপ্ত হয়ে আছে আসলে তীব্র ব্যঙ্গের দিকটি। জীবনে সংগ্রাম করতে প্রতিনিয়ত ব্যস্ত মানুষেরা একদিকে আর একদিকে তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মানুষেরা, যারা পাঠ নিতে আসছে প্রথমোক্ত মানুষদলের কাছে। বস্ত্রহীন, সংগ্রামী, ক্লান্ত মানুষদের এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। তাই জীবনের তীব্র

পরিহাসকে ব্যঞ্জিত করে লেখক শ্রেণিদ্বন্দ্বকে প্রকাশ করেছেন অনবদ্যভাবে। উচ্চকোটির মানুষদের অস্তিত্ব এই নিম্নকোটির মানুষদের ছাড়া একেবারে অর্থহীন। তাই প্রতি মুহূর্তেই আপন উচ্চাসন ছেড়ে তাদের আসতে হয় মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ানো মানুষজনের কাছে, যাদের কাছেই জীবনের আসল পাঠ নিহিত।

তথ্যসূত্র :

১. ‘শ্রেষ্ঠ গল্প: নলিনী বেরা’, করুণা প্রকাশনী, ২০২২, পৃ. ৩৫৭
২. ওই, পৃ. ৩৬০
৩. ‘শ্রেষ্ঠ গল্প, ভূমিকা : নলিনী বেরা’, করুণা প্রকাশনী, ২০২২, পৃ. ১১

লেখক পরিচিতি: ড. শম্পা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সরকারি কলেজ, পশ্চিমবঙ্গা।